।। জীবন চরিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাঁচজন পুত্রের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য ভাইদের নাম ছিল যথাক্রমে নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। পিতা দ্বারকানাথ পড়াশুনা এবং শরীরের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তিনি ছয় বৎসর বয়স থেকে পড়াশুনার সাথে সাথে নিয়মিতভাবে সঙ্গীত ও শরীরচর্চা করতেন। পরবর্ত্তীকালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা সুরু করেন এবং মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। পড়াশুনার কালেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবক্তা রামমোহন রায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং এই ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রা

ইংল্যাণ্ডে পরলোকগমন করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবরে ব্রহ্মের মহিমা প্রচারকল্পে 'তত্ত্ববোধিনী' সভার জন্ম দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ যশোহরের রায়চৌধুরী বংশের কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহীর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক নবজীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভার প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি মাত্র ২১ বৎসর বয়সে এই সভার সদস্য হন।

পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে পরলোক গমন করেন। ফলে, জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের উপর ঠাকুরপরিবার ও বৈষয়িক সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে। তিনি সমস্ত দায়িত্বকে অতি নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সাথে গ্রহণ করে নিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, জীবনচরিত, ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এই মহামানব ব্রহ্মজ্ঞানী চিরতরে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হয়ে যান।

॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

।। শৈলজারঞ্জন মজুমদার।।

১৩০৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (ইং ২০শে জুলাই, ১৯০০) বর্ত্তমান বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা পরগণাস্থিত বাহাম গ্রামে রমণীকিশোর দত্ত মজুমদার এবং সরলা সুন্দরী দেবীর যে প্রথম পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই বড় হয়ে প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ ও সঙ্গীতজ্ঞ শৈলজারঞ্জন মজুমদার নামে পরিচিত হন এবং রবীন্দ্রনাথের

অন্যতম বিশ্বস্ত পার্ষদ হিসাবে পরিগণিত হন। যদিও তাঁর পরিবারে কোন সাঙ্গীতিক পরিবেশ ছিল না, তবুও সঙ্গীতে আগ্রহী শৈলজা ছেলেবেলায় যে সব কীর্তন ও বাউল গান শুনতেন, তা কণ্ঠে তুলে রাখতেন। ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন ও পরবর্তীকালে এম. এস. সি. পাশ করে পিতার নির্দেশে আইন কলেজে ভর্তি হলেও তাঁর ভাগ্য তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অর্থাৎ রসায়ন ও সঙ্গীতের চর্চা এবং অধ্যাপনার পথে নিয়ে যায়।

১৯২১ সালে জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের একদম কাছে আসেন 'পাগলা ঝোরা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

বন্ধুর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি দিনেন্দ্রনাথের কাছে অল্পদিনের মধ্যেই ১৪টি গান শেখেন। সেই গানগুলির মধ্যে দিয়েই সুদূর নেত্রকোণায় বসেই বৈশাখ উৎসব পালন করেন। এই সময় তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন থেকে ঐ কলেজের রসায়ন অধ্যাপক পদের জন্য আমন্ত্রণ আসে। তিনি দিনেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করার জন্য, ১৯৩২ সালে ৬ই জুলাই ওকালতির কাজ ত্যাগ করে বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আবার পরিচয় হয়। তাঁর 'গগনে গগনে আপনার মনে' গানটি কবিগুরুর প্রশংসা অর্জন করে এবং এরপর 'কালের যাত্রা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং ক্রমে ক্রমে বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে 'শাপমোচন' ও গীতোৎসবের দলের অন্যতম শিল্পী হিসেবে তিনি কবিগুরুর সাথে সিংহল ভ্রমণ করেছিলেন এবং ঐ বছরই দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বয়ং কবি শৈলজারঞ্জনের সঙ্গীত শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দিনেন্দ্রনাথের পর শৈলজারঞ্জনই তাঁর গানের একমাত্র ভাণ্ডারী হবার যোগ্য। বছরের পর বছর ক্লান্তিবিহীন ভাবে তাঁকে ক্রমশঃ তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য, শৈলজারঞ্জনও এই অমূল্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কবি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'গীতাম্বুধি'। কবির নির্দ্দেশে শৈলজারঞ্জন সঙ্গীত শিক্ষকতার কাজ সুরু করেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিল মোহর (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), নীলিমা সেন, অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা, সুবিনয় রায়, রাজেশ্বরী দত্ত (বাসুদেব) প্রমুখ এবং বর্ত্তমান কালের প্রথম সারির রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ সেন, মায়া সেন, কমলা বসু, গীতা ঘটক প্রমুখ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এরপর তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি গীতবিতান, দক্ষিণী, সুরঙ্গমা প্রভৃতি অভিজাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনগুলি সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেন। শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশ ও রেঙ্গুনেও তিনি গেছেন টেগোর সোসাইটির আমন্ত্রণে।

১৯৭৪ সালে রবীন্দ্রভারতী 'ডি. লিট' ও ১৯৮৫ সালে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দান করে।

।। অনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার।।

শ্রীহট্ট জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ) ১৯০৩ খ্রীঃ আগু দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীতশ্রেষ্ঠী শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীঅক্ষয়কুমার দস্তিদার ও মাতা চারুবালা দস্তিদার। বড় ছেলে অনাদিকুমার দস্তিদার ও ছোট ছেলে অবনীকুমার দস্তিদারের সুশিক্ষার আশায় পিতা অক্ষয়কুমার ১৯১২ খ্রীঃ 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে' (শান্তিনিকেতন) তাদের ভর্ত্তি করেন।

অনাদিকুমার দস্তিদারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৯২০ খ্রীঃ ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে তিনি কলিকাতার সিটি কলেজে আই. এস. সি. ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৭ খ্রীঃ পাশ করেন ও ১৯২৯ খ্রীঃ বি. এ পাশ করেন।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও শিক্ষা করেন যথাক্রমে নকুলেশ্বর গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে এবং পিঠাপুরমের মহারাজার সভাবাদক পণ্ডিত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে তিনি কিছুকাল বীণাবাদনেও শিক্ষা লাভ করেন তথা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রায় পাঁচ বৎসরাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। শ্রীদস্তিদার শান্তিনিকেতনে ক্ষিতীমোহন সেন শাস্ত্রী, বিধুশাস্ত্রী, নেপাল চন্দ্র রায়, সি. এস. এনড্রুজ ও ডবলিউ. পিয়ারসন্ ইত্যাদি বিদগ্ধজনের কাছে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পান।

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ছাড়াও 'সঙ্গীত সম্মিলনী', 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' ও 'গীতবিতানে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষকতা করেন। তাছাড়া সিনেমা, রেডিও, রেকর্ড ও থিয়েটারে তিনি একজন সুদক্ষ ট্রেনার হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকরের সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষক, শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁর বন্ধু ও শিষ্য। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কুন্দলাল সায়গল ও কানন দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর শুভ প্রচেষ্টায় গঠিত স্বরলিপি সমিতিতে অনাদিকুমার ১৯৪৮ সালে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন এবং তাঁর স্বরলিপিকৃত বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত আমরা পাই।

১৯৬১ খ্রীঃ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 'ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন' ১৯৭৩ খ্রীঃ এই রবীন্দ্রপ্রেমীকে সম্বর্ধনার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে ও 'টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এই রবীন্দ্র পূজারীকে ১৯৭৪ খ্রীঃ 'রবীন্দ্র সঙ্গীতাচার্য্য' উপাধি দিয়ে বিভূষিত করে।

স্বাস্থ্যহীনতা হেতু রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমী শ্রীদস্তিদার অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৭১ বছর বয়সে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে চিরপ্রার্থিত গুরুদেবের যাত্রা পথে পাড়ি দেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকৃতি অন্যরকম ছিল। দর্শনশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের বিশেষত গণিত চর্চায় আত্মমগ্ন থাকলেও তেমন সংগীত চিত্র, সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রবণতা ছিল। সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। বাঁশী, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাশাপাশি তিনি কতকগুলো ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তকও ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে বয়সের ব্যবধান অনেক থাকলেও সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের স্নেহ ছিল অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বড়দাদাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বড়দাদা তাঁকে নানা বিষয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। একথা তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক দিন দূর হইতে দেখিয়া তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিজের দিকজননে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন কেদারায় কাব্যপুষ্টিতে ছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—কেবল আনন্দ আবেগ পূর্ণছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

সাহিত্য ও গীতিকুশলতা—এই উভয় ধারারই মিলন ঘটেছিল মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে আর এই গুণ ক্রমে সংক্রামিত হয়েছিল তাঁর অনুজদের মধ্যেও। তাই হয়ত এঁরা সকলেই এই দুই ধারারই অনুসারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য ও সঙ্গীত—এই দুটো আলাদা ধারাকে একই মিলনসূত্রে গেঁথে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে নতুন পথের সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যান্য ভাইদের মত রবীন্দ্রনাথও সে পথের পথচারী হয়েছিলেন। তাছাড়া সঙ্গীতে বড়দাদার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"বড়দাদা সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন, ছেলেমানুষ, আমার তথায় প্রবেশ ছিল না। কারণ তখনকার দিনে ছেলেমানুষের অনেক অপরাধ ছিল। তানপুরার কান কখনো মুড়ি নি, তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল। এমনি করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই তোমাদের কাছে আওড়ালাম। তোমাদের যা দিয়েছি, এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই দিয়েছি।"

... মধ্যে সর্বপ্রথম ...

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঃ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। দর্শনশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের—বিশেষত গণিত চর্চায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিল্প, সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রবণতা ছিল। সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বাঁশী, হার্মোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাশাপাশি তিনি কতকগুলো ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি পদ্ধতির প্রথম পথপ্রদর্শকও ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে বয়সের অনেকটা তফাৎ থাকার ফলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের স্নেহ ছিল অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বড়দাদাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বড়দাদা তাঁকে নানা বিষয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। একথা তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগ-পূর্ণছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

সাহিত্য ও গীতিকুশলতা—এই উভয় ধারারই মিলন হয়েছিল মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে আর এই গুণ ক্রমে সংক্রামিত হয়েছিল তাঁর কনিষ্ঠদের মধ্যেও। তাই হয়ত এঁরা সকলেই এই দুই ধারারই অনুকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য ও সঙ্গীত—এই দুটো আলাদা ধারাকে একই মিলনসূত্রে গেঁথে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে নতুন পথের সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যান্য ভাইদের মত রবীন্দ্রনাথও সে পথের পথচারী হয়েছিলেন। তাছাড়া সঙ্গীতে বড়দাদার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"বড়দাদা সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন, ছেলেমানুষ, আমার তথায় প্রবেশ ছিল না। কারণ তখনকার দিনে ছেলেমানুষের অনেক অপরাধ ছিল। তানপুরার কান কখনো মুড়ি নি, তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল। এমনি করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই তোমাদের কাছে আওড়ালাম। তোমাদের যা দিয়েছি, এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই দিয়েছি।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঃ—মহর্ষির দ্বিতীয়পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সিভিলিয়ন। তাহলেও তাঁর লেখনী থেকেই বেরিয়েছিল—

"মিলে সবে ভারত সন্তান—একতান মনপ্রাণ—
গাও ভারতের যশোগান।"

সত্যেন্দ্রনাথ সেযুগে উচ্চরাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সঙ্গীতে
র স্বাভাবিক অনুরাগ কখনও ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয়নি। তিনি অল্প-বিস্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ
গীতেরও অনুশীলন করেছিলেন। অনেকগুলো ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি রচনা করে গেছেন।